লতিফ মাহ্মুদভ
শিকারী বাজ
'রাদুগা' প্রকাশন মস্কো

উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
তাশখন্দ

লেখক লতিফ মাহ্‌মুদভ থাকেন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তানে। বড় সুন্দর আর প্রাচীন দেশ। উর্বর উপত্যকা, উঁচু পাহাড়, খরস্রোতা নদী, ঊষর মরু — সবই দেখতে পাবে এখানে। মধ্যযুগীয় সুন্দর সুন্দর মসজিদ, সমাধিমহল আর প্রাসাদ উজবেকিস্তানের বহু শহরের শোভা বর্ধন করছে। অবশ্য হ্যাঁ, এখন আর এগুলোতে কেউ বাস করে না — এগুলো এখন প্রাচীন সংস্কৃতির যাদুঘর। যে কেউ এসে দেখে যেতে পারে। তাই ত উজবেকিস্তানের নানা শহরের রাস্তায়-ঘাটে প্রায়ই দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে যাত্রীদের ভিড় দেখতে পাওয়া যায়।

উজবেকিস্তানের নামডাক তার তুলোর জন্য। এখানে চাষীরা আদর করে তুলোকে বলে থাকে সাদা সোনা। সুতো, কাপড়, ডাক্তারী তুলো, কাগজ পাওয়া যায় তুলো থেকে, তুলোবীজ থেকে পাওয়া যায় তেল। উজবেকিস্তানের রেশম, কারাকুল পশুলোম আর অপূর্ব উজবেক গালিচার কদর আছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। আজকের দিনে প্রজাতন্ত্রে পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসও মাটি খুঁড়ে বার করা হচ্ছে।

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দ শহর — যেমন প্রাচীন, তেমনি নবীন। এমনটি হওয়ার কারণ এই যে মাত্র কিছুকাল আগে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভূমিকম্পের কবলে পড়ার পর এ শহর ফের প্রায় নতুন করে গড়া হয়েছে। গোটা সোভিয়েত দেশ ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে শহরটা আবার খাড়া করে তুলতে উজবেকদের সাহায্য করেছে। আগে যেখানে সরু সরু অলিগলি ছিল এখন সেখানে হাল আমলের বড় বড় বাড়িঘরের মহল্লা ছড়িয়ে আছে। চিরাচরিত প্রথার যে নালা আর খাল ছিল সেই জায়গায় রাস্তায়-ঘাটে, চকে, ঘরবাড়ির আঙিনায় তৈরি হয়েছে জলের ফোয়ারা। প্রচণ্ড গরমের সময় এই ফোয়ারার জল তাপ জুড়ায়, বাচ্চারা অনেক সময় এসব জায়গায় মহা আনন্দে দাপাদাপি করে। যে দিকে চোখ যায় সবুজ আর সবুজ — সবুজের মেলা। এখানে ফুলগাছ আছে, বড় বড় গাছপালা আছে, ঝোপঝাড়ও আছে। উৎসবের সাজে পরিপাটি শহর, আর সবচেয়ে বড় কথা এখন এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যে ভূমিকম্প সহ্য করার ক্ষমতা তার আছে।

আমাদের দেশ দেখার আমন্ত্রণ জানাই।
মরুভূমিতে অবশ্য একটু গরম লাগবে। বরং
পরের পাতায় চলে যাই।

এখানে পাহাড়পর্বতের মাঝখানে নদীর ধারের
সবুজ উপত্যকায় অনেক ভালো, তাই না?

উজবেকিস্তানে লোকে সারাদিন রোদে পুড়ে শরীর জুড়ানোর জন্য হাতে-তৈরি সুন্দর সুন্দর পেয়ালায় গরম গরম সবুজ চা খায়।

আমাদের দেশে বেড়াতে এলে পুরনো আমলের বিখ্যাত সমস্ত মন্দির মসজিদ আর প্রাসাদ অবশ্যই দেখতে হয়।

উজবেকিস্তানের সবই পুরনো নয় — অনেক
নতুন নতুন ঘরবাড়ি, স্কুল আর কলকারখানাও
এখানে আছে।

শিকারী বাজ

ইচ্ছে না থাকলেও চাপাটির শেষ টুকরোটাও আমায় চিবুতে হল। খাওয়ার পর চামচটা এক পাশে সরিয়ে রাখলাম। তারপর দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো খড়ের নতুন টুপিটা পেড়ে নিলাম। গরমের ছুটি কাটাতে এবারে আমি গাঁয়ে যাব বলে যখন ঠিক হল তখনই আমার মা আমাকে এই টুপিটা কিনে দেন।

'এই মুরাদ!' রান্নাঘর থেকে দিদার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম আমি।

'কোথায় চল্লি রে?'

'যাচ্ছি দাদুর কাছে, তরমুজ ক্ষেতে।'

'এই গরমে? না হয় ঘরেই বসে থাক একটু। তুই শহুরে ছেলে, গরমে কি আর অভ্যেস আছে তোর? যাদের অভ্যেস নেই রোদ তাদের একদম বরদাস্ত করতে পারে না। যদি যেতেই হয় তাহলে সন্ধেবেলায় যখন একটু ঠান্ডা পড়বে তখন যাস। দাদুর সন্ধের খাবারটাও নিয়ে যেতে পারিস তখন।'

আমি বেজার হয়ে মাথার টুপি খুলে আবার বসে পড়লাম, পাশে রাখলাম টুপিটা। দিদাকে আমি খুব ভালোবাসি, তাঁর কথা সব সময় শুনিও। কিন্তু লোকে যে এখনও আমাকে একটা বাচ্চা ছেলে বলে ভাবে এটা আমার একদম পছন্দ নয়। বিশেষ করে আরও খারাপ লাগে যখন লোকে আজেবাজে নানা গপ্প বলে আমাকে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করে। দিদা কিনা আমাকে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করছেন রোদের ভয়

দেখিয়ে! অবিশ্যি হ্যাঁ, দিদার পক্ষে বোঝা মুশকিল আগে যে মুরাদকে বাবা-মা সঙ্গে করে গাঁয়ে নিয়ে আসতেন আমি এখন আর সেই মুরাদ নেই। আমি এখন ক্লাস ফোর-এ উঠেছি। আমার মা একা কিছুতেই আমাকে ছাড়ছিলেন না তাইতে বাবা বললেন:

'মুরাদ এখন বড় হয়েছে, সত্যিকারের লায়েক ছেলে হয়ে উঠেছে। যাক, একাই যাক। আমরা এক হপ্তা পরে যাচ্ছি। শহরে বসে থেকে ছুটির সময়টা বেঘোরে নষ্ট করতে যাবে কেন?'

বেঘোরে ছুটির সময় নষ্ট করা কাকে বলে কে জানে? তবে বাবার কথায় আমার দারুণ আনন্দ হল। অবিশ্যি রহ্‌মতকে ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছিল না। তবে সেও ত শিগ্‌গিরই ছুটি কাটাতে বাইরে যাচ্ছে।

বাবা ট্যাক্সি করে আমাকে স্টেশনে নিয়ে এলেন। আমি বিদায় নিয়ে একা ট্রেনে চেপে বসলাম। পুরো এক ঘণ্টার পথ। শুধু স্টেশনে আমার যখন গাড়ি থেকে নামার সময় হয়ে এসেছে তখন এক বৃদ্ধা মহিলা আমায় তাড়া দিতে লাগলেন, 'এই ছেলে, নেমে পড়! দেখিস, সাবধান কিন্তু!' যন্ত্রণার একশেষ! মা নাকি তাঁকে বলে দিয়েছিলেন নামার সময় যেন আমাকে দেখেন। আমি যেন আর নিজে নামতে পারি নে! আসলে সব বুড়িই এইরকম। তবে বুড়োদের কথা আলাদা। তাই ত দাদুর কাছে ছুটে যাবার অত ইচ্ছে আমার! দাদুর সঙ্গে থাকার মজা অনেক বেশি। দাদু সব সময় মজার নানা গপ্প বলেন। কিন্তু দিদা সারাক্ষণ রান্নাঘরেই ব্যস্ত, ঘরের কাজে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, সন্ধে হতেই বড় হয়রান হয়ে পড়েন। তাই দিদাও ওরকম অনেক গপ্প জানলে কী হবে, বলার ফুরসৎ তাঁর নেই।

দিদা একটা ভরা বাটি এনে আমার সামনে রাখলেন। আমি বলতে যাচ্ছিলাম পেটে আর জায়গা নেই, তিন ঘণ্টা ধরে সমানে খেয়েছি। কিন্তু মনে পড়ে গেল মা বলে দিয়েছেন দিদার কথা যেন শুনি, তাঁর মনে যেন দুঃখ না দিই। তাই চুপ করে গেলাম।

দিদা বললেন, 'নে, খেয়ে নে। এটা খেলে গরমে আর তেমন কষ্ট হবে না। এ হল বরফ দেওয়া ঘোলের সরবত।'

'আচ্ছা, এই অলক্ষুণে গরমের জ্বালায় কত লোক মারা গেছে কে জানে?' মনে মনে এই বলে বাটিটা তুলে নিয়ে ইচ্ছে না থাকলেও আমি একটু চুমুক দিলাম। ঘোলের সরবতটা সত্যি সত্যি ভারী চমৎকার। আমি তৃপ্তির সঙ্গে সবটা খেয়ে ফেললাম। 'দিদা ঠিক জানেন কোন্ জিনিসটা খেতে দিতে হয়,' ভেবে আমার বেশ গর্ব হল।

'আমাদের এখানে তোর বড্ড একঘেয়ে লাগছে তাই না রে?'

'না, না। এখন আর লাগছে না।'

'জুরাকুলকে ডাকব? দু'জনে একসঙ্গে দিব্যি খেলতে পারতিস।...'

'জুরাকুল আবার কে?'

'আমাদের পাশের বাড়ির ছেলে।' একটু ভেবে দিদা বললেন, 'সব সময় একটা না একটা দুষ্টুমি ওর লেগেই আছে, তবে মোটের ওপর ছেলে খারাপ নয়।'

বেড়ার কাছে গিয়ে, দু'হাত চোঙ্গের মতন ক'রে মুখের কাছে নিয়ে দিদা চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, 'জুরাকুল, এই জুরাকুল!'

'কী হল?' সরু কিন্‌কিনে একটা গলার আওয়াজ শোনা গেল। শুনে বলা কঠিন ছেলের না মেয়ের গলা।

'আমাদের বাড়িতে আয় রে, এখানে আমার নাতি মুরাদ এসেছে। দু'জনে খেলা কর্।'

পাশের বাড়ি থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না। তবে এক মুহূর্তে পরেই আয়নার ওপরে সূর্যের আলো পড়লে যেমন হয় বেড়ার মাথার ওপর তেমনি কী যেন একটা ঝলক দিয়ে উঠল। ওটা আর কিছুই নয়, জুরাকুলের চাঁছাছোলা ন্যাড়া মাথাটা। আমার মনে হল কোথায় যেন দেখেছি এই ছেলেটাকে। চোখদুটো ওর ডাগর। প্রথমে একটু হুঁশিয়ার হয়ে আমার ওপর চোখ বুলাল, তারপর ঠেঁটার মতো এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বিশেষ করে সে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আমার নতুন টুপিটা। পরে চোখ কোঁচকাল, চোখের দুটো সরু ফাঁক ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

'অমন হাসছ কেন?' আমি রেগে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'তোমার কি মনে নেই স্টেশনে কী কাণ্ডটা বাধিয়েছিলে?'

'নু-না... মনে নেই ত।...'

'মনে নেই বলছ? তাহলে পাহারাদার কার কান মলে দিয়েছিল?'

'আমি তার কী জানি?' আস্তে করে এই কথা বলে আমি পিছন ফিরে তাকালাম।

আমার ভাগ্যি ভালো বলতে হবে দিদা ততক্ষণে রান্নাঘরে ফিরে গেছেন। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

জুরাকুল কিন্‌কিনে গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'তাহলে কী বল, আসব তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাফ দাও,' আমি চটপট বলে উঠলাম।

এই জুরাকুলের যদি এমন গলায় কথা বলার অভ্যেস থাকে, তাহলে আর দেখতে হবে না— দিদা এখান থেকে কেন, সেই শহরে বসে থাকলেও সব শুনতে পাবেন।

'বেড়া ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না,' এই বলে সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে

যোগ করল জুরাকুল, 'এর জন্যে তোমার দিদাও আরেকটু হলেই আমার ডান কানটা ছিঁড়ে দিয়েছিলেন।'

সাদা দাঁত আর ন্যাড়া মাথার ঝলক দিয়ে জুরাকুল অদৃশ্য হয়ে গেল বেড়ার ওধারে। এবারে আমার কোন সন্দেহ রইল না যে এই সেই ছেলে যে আমার কান বাঁচিয়েছিল। আমি অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে ওকে চিনতে পারতাম যদি অমন বোকার মতো না হাসত। রহমতও এক সময় অমন ভাবে হাসত। তাই বলছিলাম কি, জুরাকুলের এই অভ্যাস কেটে গেলে তাকেও চমৎকার ছেলে বলা যাবে। যাই বল না কেন, ও না থাকলে আমার কানদুটো রাগী পাহারাদার বুড়োর হাতে রেখে দিয়ে আসতে হত।

কী হয়েছিল তাহলে বলি। গাড়ি যখন স্টেশনে ঢুকছে তখন আমি ভেবেছিলাম প্ল্যাটফর্মে বহু লোকজন থাকবে, তারা সবাই ভক্তি গদগদ হয়ে আমার দিকে তাকাতে থাকবে। আমার শুধু আফশোস হচ্ছিল এই ভেবে যে আমার চেনাজানা ছেলের দল আর রহমত এই সময় আমাকে দেখতে পাবে না।

ট্রেন থেকে নেমে আমি চারদিকে ফিরে তাকালাম। একটা হাড় জিরজিরে বাদামী রঙের নেড়ী কুত্তা যেন কিছুই করার নেই বলে আলসেমি করে একটা উপছে পড়া ডাস্টবিন শুঁকে বেড়াচ্ছে। এছাড়া কোথাও জনমানবের কোন চিহ্ন নেই।

ভয়ংকর গরম পড়েছে। আকাশ আর মাটি যেন চুলোর আগুনে গনগন করে পুড়ছে। কুকুরটাকে আমি এক তাড়া দিয়ে খেদিয়ে দিলাম, তারপর একটা জলের কলের কাছে গেলাম। গায়ের জামাটা খুলে কলের তলায় গা পেতে দিলাম। জল ঠাণ্ডা নয়, একটু গরমের দিকে। তাহলেও শরীর খানিকটা জুড়ানো গেল।

আমি যখন জামাটা পরছি সেই সময় পাহারাদার এসে দেখা দিল। চলতে চলতে সে একটা ক্যাম্বিসের খোলের ভেতরে গোটানো কতকগুলো রঙবেরঙের ছোট ছোট পতাকা ভরে রাখছে। বুড়ো আমার মাথার ওপর দিয়ে এমন ভাবে তাকাল যেন আমার ওখানে থাকা না থাকা সমান, তারপর অলস ভাবে হাই তুলতে তুলতে নিজের গুমটিতে ঢুকে পড়ল। গুমটির ভেতর থেকে সে নিয়ে এলো একটা খাঁচা — খাঁচাটা এক টুকরো জালি কাপড়ে ঢাকা। খাঁচাটা দরজার কাছে একটা আঙটার গায়ে ঝুলিয়ে পাহারাদার আবার ফিরে গেল গুমটির ভেতরে। খাঁচার ভেতরে কী একটা পাখি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, জালি কাপড়টা ঠোকরাচ্ছে। আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল ওটা কী পাখি। আমি ডিঙ্ মেরে উঠে ঘাড় উঁচু করলাম, কিন্তু কাপড়টার জন্য দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল। এদিকে দেখার বড় সাধ।

আমি সাবধান হওয়ার জন্য খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম। পাহারাদার একটা তক্তপোশের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে ঝিমুচ্ছে। আমি তখন এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা কিছু কাঠের বাক্স দেখতে পেয়ে সেখান থেকে দুটো তুলে নিয়ে এলাম খাঁচাটার কাছে। একটার ওপর আরেকটা বাক্স রেখে আমি ওপরে উঠে পড়লাম। কাপড়টা ওঠাতে যাব, এমন সময় বাক্সগুলো নড়বড় করে উঠল, পায়ের তলা থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে গেল। আমি দু'হাতে হাতড়াতে হাতড়াতে শেষকালে খাঁচাটাই চেপে ধরলাম। ভেতর থেকে কী যেন একটা বেরিয়ে পড়ল, দুটো ভারী ডানা

ধপাধপ নাড়াল, হাপরের মতো হাওয়া ছাড়ল আমার গায়ের ওপর — আমি হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম। এর পর আর যায় কোথায়? — বুড়ো বেরিয়ে এসে আমার কান পাকড়াও করল!

অবিশ্যি এটা ঠিক যে খুব একটা ব্যথা লাগার মতো জোরে চেপে ধরে নি, কিন্তু তাইতেই আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। এমন সময় একটা সবুজে-বেগনী রঙের গাধার পিঠে চড়ে সেখানে এসে হাজির হল জুরাকুল। সে-ই আমাকে বাঁচাল।

'এই দাদাভোই-আকা, কী করেছে এ? অমন বিচ্ছিরি দাওয়াই দিচ্ছেন কেন ওকে?' পাহারাদারকে চেঁচিয়ে সে বলল। তার গলায় খুশির সুর। চোখদুটো বুজে যাওয়ার সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে দুটো সরু ফাটল।

পাহারাদার মুহূর্তের জন্য আমার কান ছেড়ে দিল, আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল,

'যেখানে নাক গলানো উচিত নয় সেখানে নাক গলাতে গিয়েছিল বলে এই দাওয়াই দেওয়া হচ্ছে ওকে। তাই বাপু তোমাকেও বলি, তুমিও নাক গলাতে না এলেই ভালো হয়।...'

কানে হাত দিয়ে দেখি কানটা তেতে ঝাঁঝাঁ করছে। এই ফাঁকে আমিও সটকান দিলাম।

স্টেশন থেকে গাঁয়ের দিকে অর্ধেক পথ ছুটে যাবার পর তবেই আমি আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে মনে মনে ভাবলাম, 'ও কিছু নয়, দাদুকে বললেই হবে — ওই বুড়ো পাহারাদারের কত পাখি চাই ধরে দেবে।' ভেবে আমি একটু সান্ত্বনাও পেলাম। তারপর যখন দিদাকে দেখতে পেলাম তখন আমি ভুলেই গেলাম কী হয়েছিল। এখন, এই মাত্র জুরাকুল মনে করিয়ে দিল। আমার বুকের ভেতরটা আবার

খচখচ করতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, 'আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে আমার ধাক্কা লেগে খাঁচা থেকে কোন দামী গাইয়ে পাখি বেরিয়ে গেছে! তখন কী করে আরেকটা দামী গাইয়ে পাখি দিয়ে বদল করব?'

জুরাকুল বলল, 'চল, গাধার পিঠে চেপে একটু বেড়িয়ে আসি।' সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'আরে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, বোধহয় অনেকক্ষণ হল ফিরে এসেছে।'

'কে? কার কথা বলছ?'

'কে আবার? শিকারী বাজ!'

'খাঁচার ভেতরে শিকারী বাজ ছিল নাকি?'

'অবিশ্যিই। তবে ওটা বাজপাখি নয় ত — সত্যিকারের একটা উড়োজাহাজ। আমাদের সারা গাঁয়ে অমন আর একটাও নেই।'

'আচ্ছা, জুরাকুল বল, তুমি কি দেখেছ? ফিরে আসতে দেখেছ ওকে?'

'তা দেখি নি, কিন্তু যাবে কোথায় ও?' অবাক হয়ে বলল জুরাকুল। 'ওটা যে পোষা। নিজের খাঁচায় ফিরে আসবেই আসবে। বিশ্বাস না হয় চল দেখে আসি।'

'দিদা ছাড়বে না।'

'কেন?'

'বলছে রোদে ঘোরাঘুরি করলে খারাপ হতে পারে।'

'দাঁড়াও!' বলে জুরাকুল ছুটে রান্নাঘরের ভেতরে উধাও হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বাদে এক ছুটে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে বলল, 'চলে এসো। রাজী হয়েছে।'

আমি টুপিটা তুলে নিলাম।

'ছায়ায় ছায়ায় খেলবে কিন্তু, কেমন, জুরাকুল?' পেছন পেছন দিদা চেঁচিয়ে বললেন।

পেছন ফিরে না তাকিয়ে জুরাকুল উত্তর দিল, 'সে আর বলতে! আমরা কি অতই বোকা যে রোদে খেলব?'

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। সূর্য পপলার গাছগুলোর পেছনে লুকিয়ে পড়েছে। ফেকাসে পাতাগুলো নির্জীব হয়ে ডালাপালা থেকে ঝুলছে। নদীর ধারে অলস ভাবে চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা গোরু। সাঁকোর ওপর দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল, খানিক দূর গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল।

জুরাকুল বলল, 'নতুন গাড়ি। গাড়িটা এদিকে এলে আমরা ওটাতে চেপে একটু বেড়াতে পারতাম। তা যাক গে। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি চট করে আমাদের গাড়িটা নিয়ে আসছি।'

এক মুহূর্ত পরেই সে নিয়ে এলো তার গাড়ি — সবুজে-বেগনী রঙের সেই গাধাটা।

'একটু ধর দেখি,' বলে সে লাগামটা আমার হাতে ছুঁড়ে দিল। উবু হয়ে বসে ভারিক্কি চালে প্যাণ্টটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'এখন যাওয়া যেতে পারে।'

খানিকটা পিছু হটে গিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে এক লাফে বেশ কায়দা করে গাধার পিঠে উঠে পড়ল। তারপর আমি কোন রকমে চড়ে বসলাম। কিন্তু গাধাটা ততক্ষণে জোর কদমে নদীর দিকে চলতে শুরু করেছে। আমি পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক হয়ে বসলাম।

'দেখছিস, কী জোর ছুটছে!' খুশিতে ডগমগ হয়ে চিৎকার করে বলল জুরাকুল। 'গাধা ত নয়, পক্ষিরাজ ঘোড়া। তাছাড়া এলেবেলে নয়, দস্তুরমতো তালিম পাওয়া। দাদাভোই-আকার বাড়ির কাছে আসামাত্রই পায়ের ব্রেক কষিয়ে থেমে যাবে — আর নড়বে না। কেন জানিস? ওখানে খাওয়া পায়।'

'দাদাভোই-আকা... তার মানে সেই...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-ই, যে তোর কান ছিঁড়ে দিতে চেয়েছিল। ওর আবার একটা মেয়েও আছে। এমন বদরাগী না, দেখলে মনে হয় যেন সব সময় মশার কামড়ে ঝালাপালা হয়ে আছে।'

হাসতে হাসতে সে গলার স্বর বিদঘুটে করে একটা গান ধরল:

পাহাড়ে পর্বতে ঘোরাঘুরি করি,
ঠাণ্ডায় শীতে হিহি জমে মরি,
বন্ধু গো মোর বিপদে আপদে
সহায় আছিলে প্রতি পদে পদে।
ওগো দীপখানি, ছোট দীপখানি তুমি!

জুরাকুল গান গাইতে গাইতে গাধার পিঠে বসে ঠ্যাঙ দোলাতে লাগল। তারপর গান থামিয়ে হোহো করে হাসতে শুরু করে দিল।

'কী হল? হাসছ যে?' আমি ওর জামার আস্তিন ধরে টানলাম।

'ঘাবড়াস নে, তোর কথা ভেবে নয়। এই মাত্র মনে পড়ে গেল সকালে যখন আমি স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম তখন নদীর ধারে দাদাভোই-আকার সেই মেয়ে জামিলিয়াকে দেখি জামাকাপড় কাচছে। আমি গাধার পিঠ থেকে নেমে পা টিপে টিপে পেছন থেকে এসে 'হুম্‌' করে এক আওয়াজ ছাড়লাম। অমনি ঝপাং করে সে পড়ল গিয়ে নদীর জলে। ভয়ে চম্‌কে উঠে আর কি!'

জুরাকুল সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে সে পেট চেপে ধরল। গাধাটা যেন হুকুম পেয়ে পায়ের বেগ বাড়িয়ে দিল।

তারপর জুরাকুল বলল কী ভাবে দুটো পায়রা বদল করে এই গাধাটা পেয়েছে। হাসতে হাসতে সে বলল যে গাধার মালিক সেই ছেলেটা রোজ তার কাছে এসে গাধা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হাতে পায় ধরে।

'কিন্তু আমি বলে দিয়েছি কথার দাম টাকার চেয়ে বেশি।' এই বলে জুরাকুল আবার হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরল।

জুরাকুল আরও বলল যে সে খুব উঁচু গাছ থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, অন্ধকারের মধ্যেও পাকা তরমুজ খুঁজে বার করতে পারে।

'যদি চাস আমি তোকে শিখিয়ে দিতে পারি,' বলে সে আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল।

এমন সময় আমাদের 'গাড়িটা' ব্রেক কষে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল।

'কেমন, তোকে বলি নি, তালিম পাওয়া গাধা!' বলে জুরাকুল হাঁকডাক শুরু করে দিল, 'জামিলিয়া, এই জামিলিয়া!'

'কী চাই তোর?' বেড়ার ওপাশ থেকে কার যেন রাগী গলার আওয়াজ ভেসে এলো।

'কিছু খাবার নিয়ে আয়। আমার গাধাটার কচি ভুট্টা খাবার বড় ইচ্ছে হয়েছে।'

'কী, আমি তোর চাকরানী নাকি? দাঁড়া, আলাপারকে ছেড়ে দিচ্ছি, তোর আর তোর ওই গাধার ঠ্যাঙ চিবিয়ে ছাড়বে এখন।'

আমার দিকে ফিরে জুরাকুল বলল, 'দেখলি ত, ভয়ংকর পাজী মেয়ে। একবার রেগে গেলে আর রক্ষে নেই — শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিতে পারে।'

একটুখানি ভেবে জুরাকুল মাটিতে লাফিয়ে থামল।

'রোস,' এই বলে মাটিতে পোঁতা একটা লম্বা লগির মাথায় সে উঠতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে তার গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলাম, কী ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম একমাত্র তখনই যখন দেখতে পেলাম লগি থেকে বাড়ির উঠোনে টাঙানো দড়ির বাঁধনটা সে খুলে ফেলল।

'হয়ে গেল!' গলা ফাটিয়ে, শিস দিয়ে বলে উঠল জুরাকুল।

দড়িতে ঝোলানো জামাকাপড় ডানা ঝাপটা দিয়ে বেড়ার ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। উঠোন থেকে ভেসে এলো মেয়েটার সরু সরু গলার কান্না।

'অমন করতে গেলে কেন বল ত? একজন খাটাখাটনি করে কাপড়চোপড় কেচেছে আর তুমি কিনা...' বলতে বলতে আমি গাধার পিঠ থেকে নেমে জুরাকুলের দিকে এগিয়ে গেলাম। 'এটা... এটা কিন্তু অন্যায়।'

'আরও কিছু!' হাত ঝাড়া দিয়ে সে বলল। 'একটু খাবার এনে দিলে কী এমন বয়ে যেত ওর!'

'সেটা ওর ব্যাপার। ইচ্ছে হলে দেবে, নইলে না দেবে।'

'তার মানে তুই আমার পক্ষে নোস, অ্যাঁ? আর আমি কিনা বোকার মতো তোর জন্যে এত চেষ্টা করলাম!'

'আমার জন্যে?'

'তা নয়ত কী! বাজপাখিটাকে কে ছেড়ে দিয়েছিল শুনি? তুই। দিদার কাছে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিল কে? তুই। তোর ওপর মায়া হতে কে তোকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল? আমি! আমি, জুরাকুল!' কপালে চাপড় মেরে সে বলল।

আমি উত্তর দেবার সময় পেলাম না। গেট খোলার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা গেল, ভেতর থেকে রাস্তায় গলা বার করে দিল জামিলিয়া।

'বাজপাখি ঘরে ফিরে এসেছে,' সে বলল। 'ওই যে খাঁচায় বসে আছে।'

জুরাকুল সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল, তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'বলি নি! চলে আয় মুরাদ, দেখে আসি। তোর আলাপার বাঁধা আছে ত জামিলিয়া?'

'চলে আয়, ভয় পাবার কিছু নেই।' জামিলিয়া তাকে ভেতরে ঢুকতে দিল।

আমি ওর পেছন পেছন পা বাড়ালাম। কিন্তু গেট দড়াম করে আমার নাকের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। আমি ভেবাচেকা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম: 'তাজ্জব ব্যাপার! জামিলিয়ার মনে যদি কেউ দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে সে হল জুরাকুল, অথচ সাজা পেতে হচ্ছে কিনা আমাকে!'

'হুঁ হুঁ এইবার, যাবি কোথায়!' উঠোন থেকে উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল।

আমার খুব জানার ইচ্ছে হচ্ছিল ওখানে কী হচ্ছে। আমি ঝুঁকে পড়ে বেড়ার একটা ফাঁকে চোখ রাখলাম।

গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে জুরাকুল। তার পায়ের কাছে শুয়ে আছে কানকাটা একটা কুকুর। জুরাকুল যেই একটু নড়াচড়ার চেষ্টা করছে অমনি তেড়ে ফুঁড়ে বিকট গর্জন শুরু করছে কুকুরটা।

'পালানোর কথা মনেও আনিস নে — তাহলে ঠ্যাঙ আর আস্ত থাকবে না,' জামিলিয়া শাসাল।

'ওসব ইয়ার্কি ছাড়্। এটাকে সরিয়ে দে বলছি, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।'

'ইয়ার্কি আমি মোটেই করছি না। এই যে ধর্!' জামিলিয়া একটা থলে বাড়িয়ে ধরল তার দিকে। 'জামাকাপড়গুলো তুলে এই থলের ভেতরে ভরে রাখ্।'

'আহা কী আমার আবদার!' জুরাকুল হাসল বটে, কিন্তু হাসির মধ্যে তেমন খুশির ভাব ফুটে উঠল না। 'দরকার হলে নিজেই ভরে রাখ্।'
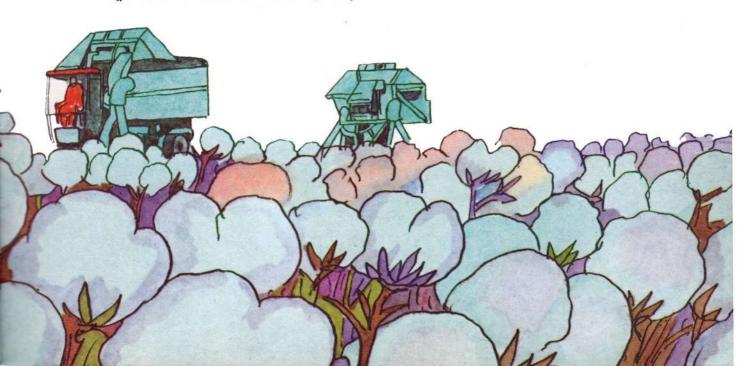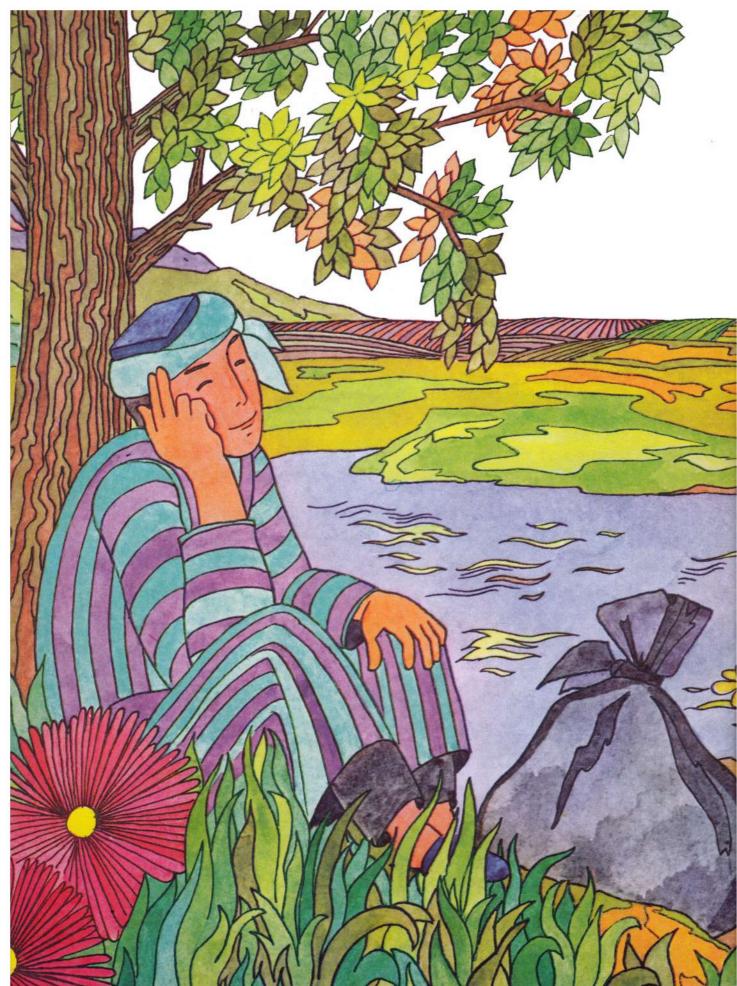
'ভরবি না বলছিস? আলাপার!'

কুকুরটা প্রথমে তার কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল জুরাকুলের দিকে, ভয়ংকর গর্জন করে উঠল।

'তুলবি না বলছিস?'

জুরাকুল রাগ করে ওর হাত থেকে থলেটা টেনে নিয়ে একপাশে সরে গেল। আলাপার একই জায়গায় শুয়ে রইল কিন্তু জুরাকুলের ওপর থেকে দৃষ্টি সে সরাল না।

জুরাকুল জামাকাপড়গুলো উঠিয়ে থলেটা জামিলিয়ার পায়ের কাছে রাখল। 'এই যে রইল তোর জামাকাপড়। এখন খুশি ত?' এই বলে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'চললি কোথায়?' জামিলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'তাতে তোর কী? তুলতে বলেছিস তুলে দিলাম, এখন আমি আমার যেখানে খুশি যেতে পারি।'

'এখনই কী?' জামিলিয়া ওর হাতে এক টুকরো সাবান গুঁজে দিল। 'নদীর ধারে যাবি, সব আবার নতুন করে কেচে পরিষ্কার করবি।'
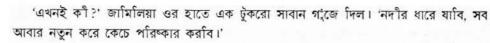
'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে!' জুরাকুল ধমকে উঠল। 'আমার কাছে মার খাবার সাধ হয়েছে বুঝি তোর?'

'একবার চেষ্টা করেই দ্যাখ না — আলাপার কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবে না তোকে!'

কুকুরটা তার নিজের নাম শুনতে পেয়ে আবার গর্জন করে উঠল। রাগে গরগর করতে করতে সাবানটা হাতে নিয়ে জুরাকুল তাকে চেঁচিয়ে ডেকে বলল, 'ঠিক আছে। চল্ তাহলে!'

'তুই একা যাবি। আজ আমার এর মধ্যেই একবার কাচা হয়ে গেছে। এবার তুই চেষ্টা করে দ্যাখ। ঘণ্টাখানেক ঝামেলা পোয়ালে পরে টের পাবি কাজটা সোজা কিনা!'

জুরাকুলের চোখেমুখে খুশির ঝলক খেলে গেল। ও বোধহয় ভেবেছিল জামিলিয়া যদি না যায়, তাহলে তার কুকুরও যাবে না। আর কুকুর যদি না যায়, তাহলে থলেটা একটা ঝোপের ভেতরে পাক মেরে ফেলে দিয়ে নিজের পথ ধরলেই হল। কিন্তু কুকুরটা যেন ওর মনের ভাব টের পেল। সে-ই প্রথম ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

'কিন্তু এই চীজটা এখানেই থাকুক, ওখানে ওর কোন দরকার নেই,' চেহারার মধ্যে কোন উদ্বেগের ভাব না ফুটিয়ে জুরাকুল বলল।

'উঁহু, এই চীজটা তোর সঙ্গে যাবে — কোন চিন্তা নেই,' জামিলিয়া হেসে বলল। 'আলাপার, শুনছিস? ওর সঙ্গে যা। ওর কাছে থাকবি, বুঝলি?'

আলাপার থলের একটা কোনা কামড়ে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল নদীর দিকে। জুরাকুল চোখ বড় বড় করে কুকুরটার দিকে তাকাল, তাড়াতাড়ি তুলে নিল থলেটা।

আশ্চর্য কুকুর বটে! ঠিক যেন ঘাঁটির পাহারাদার কুকুর! কী দারুণ তালিম পাওয়া! অমন কুকুর দেশের সীমান্ত ঘাঁটিতে পাহারা থাকলে যে কোন বদমাশকে চেপে ধরবে, কোন ছাড়াছাড়ি নেই! মোট কথা, এ গাঁয়ে বাজপাখি বল গাধা বল আর কুকুর বল সবই দেখছি তালিম পাওয়া!

জুরাকুল বলল, 'যাক গে, যেতে যখন বলছিস তখন যাব। কিন্তু পরে তুই নির্ঘাত আমার কাছে মার খাবি। আমি যদি তোকে না মারি ত কী বলেছি — তাহলে আমার নাম জুরাকুল নয়!' ওকে শাসিয়ে আমার দিকে ফিরে সে বলল, 'চল্ রে মুরাদ।'

'মুরাদও যাবে না।'

'মুরাদ যাবে কি যাবে না তুই বলার কে?' জুরাকুল শেষকালে ফেটে পড়ল। 'ও ত কোন দোষ করে নি!'

'আমি জানি ওর কোন দোষ নেই। আমি শুধু ওকে বলব দড়িটা ঠিক জায়গায় টাঙিয়ে দিতে। তারপর বলব এই ছাইরঙা-বেগনী জন্তুটাকে তার আসল মালিকের কাছে দিয়ে আসতে। তুই যা, তোকে ছাড়াই আমাদের চলবে।'

জুরাকুল বেজার হয়ে গুটি গুটি নদীর দিকে চলল। তার পেছন পেছন গম্ভীর ভাবে পা ফেলে ফেলে চলল তালিম পাওয়া কুকুরটা। জুরাকুল বোধহয় খালি পায়ের গুলির ওপর কুকুরের নিঃশ্বাস টের পাচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে কি ওর অবস্থায় পড়ার এতটুকু ইচ্ছে আমার হচ্ছিল না।

জামিলিয়া যা যা বলল সবই করলাম আমি। এমনকি ছাইরঙা-বেগনী গাধাটাকে তার আসল মালিকের কাছে দিয়ে এলাম। ফিরে আসার পর গেটের সামনে জামিলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জুরাকুলের তখনও দেখা নেই।

হাসতে হাসতে সে আমাকে বলল, 'উঠে পড়ে কাপড় কাচতে লেগেছে। আমি গিয়ে দেখে এসেছি। এত চমৎকার কাচছে না, যে কোন মেয়ে দেখলে লজ্জায় মাথা হেঁট করবে।'

জামিলিয়াকে মোটেই তেমন খারাপ মেয়ে বলে আমার মনে হল না।

আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসল, বলল, 'বাজপাখি দেখতে চাও? আমি তোমাকে দেখাব। ভয় পেয়ো না, আলাপার এখন নদীর পারে। তাছাড়া আমার মনে হয় তুমি ছেলে খারাপ নও।'

জুরাকুল ফিরল আধ ঘণ্টা পরে। তার পাশে পাশে ধীরেসুস্থে পা ফেলে ফেলে আসছে আলাপার।

'কুকুর ত নয়, গাধার সঙ্গে শয়তান মেলালে যা হয় তাই!' দূর থেকে জুরাকুল চেঁচিয়ে বলল। 'মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি নেই — সারাক্ষণ পিঠে নাক ঠেকিয়ে রইল।'

জামিলিয়ার সামনে এসে থলেটা মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বলল, 'ধর তোর জামাকাপড়, পাজী কোথাকার!'

'অমন তড়বড় করিস নে, দে, আগে দেখি কেমন ধুলি। এই যে এই জামাটা, মোটেই ভালোমতো চিপিস নি। এটা বোধহয় তুই সব শেষে কেচেছিস, বড্ড তাড়াহুড়ো করে। কাজ করার সময় তাড়াহুড়ো করা ভালো নয়। নে, ভালো করে চেপ।'

জুরাকুল বাধ্য ছেলের মতো জামাটা নিয়ে চিপল।

'আলাপার, জায়গায় চলে যা!' জামিলিয়া এবারে হাঁক দিল।

জুরাকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত মুছল, মুখ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে গেটের দিকে পা বাড়াল।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর সে বলল, 'ঠিক মারতাম ওকে। কিন্তু বড় দুঃখ হয় ওর জন্যে। আহা বেচারি, বড় কষ্টে আছে। কিছু দিন আগে ওর মা মারা গেছে। ধোয়াকাচা রান্নাবান্না সব কাজ নিজে হাতে করে।'

'সত্যিই ত তাহলে বড় কষ্ট ওর।'

'তা আর বলতে!' এই বলে সে পিছন ফিরে তাকাল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল জামিলিয়া। ছোটখাটো, রোগা মেয়েটি। দু'চোখে ঝরে পড়ছে বিষাদ আর ক্লান্তি।

'জুরাকুল!' আস্তে করে ডেকে সে বলল। 'তুই আমাকে মারবি বলে দিব্যি করেছিস, আমি জানি তুই যখন দিব্যি গেলেছিস তখন মারবিই। তাহলে বরং এখনই মার্।'

জুরাকুল মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাত নাড়া দিয়ে বলল, 'যাক গে!'

জামিলিয়া খুশি হয়ে বলল, 'তুই যে বললি আমাকে না মারলে তোর নাম জুরাকুল নয়, তাহলে এখন তোকে কী বলে ডাকব?'

'জুরাকুল বলেই ডাকবি, আবার কী!' বুক ফুলিয়ে হেসে বলল জুরাকুল। 'নামটা মন্দ হল কিসে? 'জুরা' মানে বন্ধু যে!'

সত্যিই, আমার নতুন বন্ধুর নামটা মন্দ নয়। তোমরা কী বল?

স্কুলের ছোট বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

ছবি এ'কেছেন: আন্দ্রেই প্লাতোনভ
মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

Л. Махмудов
БЕРКУТ
На языке бенгали

Latif Makhmudov
THE EAGLE
In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত
Перевод сделан по книге: Л. Махмудов.
Беркут. М., «Дет. лит.», 1970 г.

ISBN 5-05-002059-X

М $\frac{4803620101\text{-}636}{031(01)\text{-}89}$ 132-89

90 к.

ИБ № 5033

Переводчик Арун Сом
Редактор русского текста М. Шумская
Контрольный редактор В. Горонова
Художник А. Платонов
Художественный редактор С. Барабаш
Технические редакторы Н. Духанина, Е. Ростовцева
Корректор Т. Ханцик

Сдано в набор 18.02.88. Подписано в печать 21.11.89. Формат 84x108/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Бенгали. Печать офсетная. Условн. печ. л. 4,62. Усл. кр.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 7,23
Тираж 7000 экз. Заказ № 3562 Цена 90 к. Изд. № 5254.

Издательство "Радуга" В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по печати.
119859, Москва, ГСП-3, Зубовский бульвар, 17.

Фирмы-партнеры: Маниша Грантхалая (П) Лтд., г. Калькутта, Индия;
Джатия Сахитья Пракашани и Стандард Паблишерз, г. Дакка, Бангладеш.

Текст набран в ордена Трудового Красного Знамени Московской типографии № 7
"Искра революции" В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по печати.
121019, Москва, пер. Аксакова, 13. Отпечатано на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1
дважды ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского производственного объединения
"Типография имени Ивана Федорова" Государственного комитета СССР по печати.
197101, Ленинград, ул. Мира, 3.